# উত্তর পূর্বাঞ্চলের সংস্কৃতি বৈচিত্র্য

বীণা মিশ্র

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| অতীতের আলোকে অরুণাচল | ১১ |
| আর্য অনার্যের মিলনভূমি কামাখ্যা মহাপীঠ | ২৩ |
| জনজাতির রূপকথায় এক অজানা জগৎ | ৩০ |
| অসমের সংস্কৃতির বিশিষ্ট অঙ্গ—ওজাপালি ও বরগীত | ৩৯ |
| অরুণাচলে বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র— খোমং ও তাওয়াং | ৪৯ |
| গোয়ালপাড়ার লোকগীতির একটি বিশিষ্ট রূপ | ৫৯ |
| ইটা দুর্গের এক অলিখিত কাহিনি | ৬৩ |
| সো সো থাম — মেঘালয়ের জাতীয় কবি | ৬৯ |
| মেঘালয়ের দুই সংগ্রামী বীর — তিরৎ সিং ও কিয়াং নংবা | ৭৭ |
| ইতিহাসের পটভূমিকায় নারী চরিত্র | ৮৬ |
| মণিরাম দেওয়ান — অসমের প্রথম শহিদ | ৯০ |
| পূর্বাঞ্চলে মহর্ষি বশিষ্ঠ | ৯৬ |
| নীরব জ্ঞান সাধক আনন্দরাম বড়ুয়া | ১০২ |
| অসমের জাতীয় জীবনে ও সাহিত্যে জ্যোতিপ্রসাদ | ১০৯ |
| লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়ার গল্পে সেকালের অসমিয়া সমাজ | ১১৪ |

# অতীতের আলোকে অরুণাচল

'বিধাতা ভারতবর্ষের মধ্যে বিচিত্র জাতিকে টানিয়া আনিয়াছেন। ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসংগত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে'— ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি নতুন করে ভাববার দিন এসেছে। কত বিচিত্র জাতি, উপজাতি নিয়ে আমাদের এই মহাদেশ গঠিত। স্মরণাতীত কাল থেকে আমরা পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। পরস্পরের আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে, পরস্পরের আদর্শসমূহের সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে বিরাট ভারতীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে সে কথা আজ আমরা ভুলে যেতে বসেছি, তাইতো এত বিভেদ, এত দ্বন্দ্ব, এত সমস্যা! আমরা ভুলে যাই যে শত ঝড় ঝঞ্ঝা, দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ সত্ত্বেও ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা অবিচ্ছিন্ন ভাবে যুগ থেকে যুগান্তরে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। কখনও হয়তো এই স্রোতধারা ক্ষীণ হয়ে এসেছে, কখনও বা নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে হারিয়ে গেছে; কিন্তু কখনও লুপ্ত হয়ে যায়নি। একথা যে কত সত্য তা অরুণাচলের ইতিহাসের পাতা ওলটালে নতুন করে উপলব্ধি করা যায়।

ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমায় অবস্থিত, বহু জনজাতি অধ্যুষিত অরুণাচল প্রদেশ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত, অথচ অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই প্রত্যন্ত ভূমি যে কেবল আর্যসভ্যতার অঙ্গীভূত ছিল তা নয়, ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিতে এর অবদানও উল্লেখযোগ্য; কিন্তু এসব বিষয়ে আমরা যেমন অবহিত নই তেমনি সচেতনও নই। ইতিহাসের পরিক্রমা পথে এই অঞ্চলটি ভারতীয় সভ্যতার মূল ধারা থেকে কেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সেই সম্পর্কে পণ্ডিতেরা মনে করেন হয়তো এর মূলে ছিল কোনো বিশেষ প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা অথবা কোনো অনতিক্রম্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা।

এখন এক বিংশ শতকের শুরু গত শতকের মধ্যভাগে প্রত্নতত্ত্ববিদদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় অরুণাচলের দুর্গম অরণ্যে আবিষ্কৃত ধ্বংসস্তূপগুলি থেকে বিস্মৃত ইতিহাস আবার প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। এক সময় এই প্রত্যন্তভূমি যে বিরাট আর্যসভ্যতার অঙ্গীভূত ছিল সেই সত্য আবার নতুন ভাবে অনুভূত হয়েছে। এখনও এর দুর্ভেদ্য অঞ্চলে বহু সম্পদ ছড়িয়ে আছে। কালের হাতে এবং উদ্ধত, অবিবেচক বিদেশি শাসকের হাতে অনেক সম্পদ নষ্ট হয়ে গেলেও যা অবশিষ্ট আছে তা পুনরুদ্ধার করতে পারলে হয়তো অনেক চমকপ্রদ তথ্য আবিষ্কৃত হয়ে ইতিহাসে নতুন পৃষ্ঠাও সংযোজিত হতে পারে। এই ধ্বংসস্তূপগুলিকে কেন্দ্র

করে যে সব কাহিনি প্রচলিত আছে সেগুলি পর্যালোচনা করলে বিস্মিত হতে হয় এই ভেবে যে কী ভাবে সেই সুদূর অতীতে সব দুর্গমতাকে জয় করে আর্য সভ্যতা এখানে অসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল, আর্য-অনার্য ধর্ম ও সংস্কৃতির মিলন সাধন করেছিল! মন্ত্রতন্ত্রের দুর্নিবার প্রভাব, দেবীর অপরিসীম মহিমা, তান্ত্রিক ধর্মাদর্শ যা একদা ভারতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল তা যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের জনজাতির অবদান এই বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতদ্বৈধতা নেই।

অরুণাচল প্রদেশের অন্তর্গত সিয়াং জেলার গভীর অরণ্যে "মালিনীথান" নামে এক বিশাল ধ্বংসস্তূপের আবিষ্কার এই শতাব্দীর এক চমকপ্রদ আবিষ্কার বলা যায়। এই থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন দুর্গা বা পার্বতী যিনি শক্তি রূপে পূজিতা হতেন। অতীতে এই থান যে কেবল অতি পবিত্র তীর্থ রূপে পরিগণিত হত তা নয়, ভারতের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও শিল্পধারার মিলনকেন্দ্র রূপেও উত্তর-পূর্ব ভারতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। এখানে একত্রে বহু মন্দির ছিল এবং পার্শ্ববর্তী ঝোপ জঙ্গল ও মাটির বৈশিষ্ট্য থেকে অনুমিত হয় যে অন্যান্য তীর্থ স্থানের মতো এই তীর্থও ব্রহ্মপুত্র বা তার কোনো শাখানদীর তীরে অবস্থিত ছিল। এই ক্ষেত্রে শাস্ত্রানুযায়ী মন্দিরের স্থান নির্বাচিত হয়েছিল। মধ্যযুগের ধর্মীয় ইতিহাসের অতি মূল্যবান দলিল কালিকাপুরাণে কামাখ্যাপীঠের পূর্বদিকে একটি পীঠস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে খণ্ডিত সতীর মস্তক আকাশি গঙ্গার নিকটে পড়েছিল এবং সেখানে একটি মন্দিরও ছিল। সেখানে দূর দূরান্তর থেকে পুণ্যার্থীর সমাগম হত। মালিনীথান আবিষ্কারের ফলে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়। আকাশি গঙ্গা সম্ভবত পর্বত নিঃসৃত নদীর ইঙ্গিত বহন করছে।

মালিনীথানের নাম সম্পর্কে সুন্দর একটি কাহিনি প্রচলিত আছে। শিব ও পার্বতী যখন এখানে তপস্যায় রত ছিলেন তখন চেদিরাজ শিশুপালের সঙ্গে বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণীর বিবাহ স্থির হয়; কিন্তু রুক্মিণী ছিলেন কৃষ্ণগতপ্রাণা তাই তাঁর কাতর আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরী থেকে এসে তাঁকে হরণ করে নিয়ে যাবার পথে হরপার্বতীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। পার্বতী উদ্যানের শ্রেষ্ঠ ফুলে তৈরি মালা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করলে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে দেবীকে 'মালিনী' বলে সম্বোধন করেন। সেই থেকে এই স্থান 'মালিনীথান' নামে খ্যাত হয়।

গত বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে জনৈক ইংরেজ রাজপ্রতিনিধি প্রথম মালিনীথান দেখেন এবং সেখানে সাধুদের বসতিরও প্রমাণ পান। সেখানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বহু ভগ্ন মূর্তিও তাঁর চোখে পড়ে। স্থানীয় অধিবাসীদের মতে তিনি নাকি কিছু সংখ্যক মূল্যবান মূর্তি নষ্ট করে ফেলেছিলেন।

১৯৭০-৭১ সালে অরুণাচলের ঐতিহাসিক গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীলক্ষ্মীনাথ চক্রবর্তীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় যে খনন কার্য চলে তার ফলে মালিনীথানের সম্পূর্ণ রূপটি উদ্‌ঘাটিত হয়। তাঁর প্রচেষ্টায় একশতেরও অধিক দেবদেবীর মূর্তি উদ্ধার করা হয়। দেবদেবীরা

হলেন সপ্তঅশ্বের রথে সূর্যদেব, মূষিক বাহন গণেশ, ময়ূর পৃষ্ঠে কার্ত্তিকেয়, বীণা হস্তে সরস্বতী, ঐরাবত পৃষ্ঠে ইন্দ্র প্রভৃতি। এই সঙ্গে তিনখণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে থাকা দশভুজা পার্বতীর মূর্তিও আবিষ্কৃত হয়। এই মূর্তিটি সংযোজিত হলে দেখা যায় ভাস্কর্যের এক অনুপম নিদর্শন কীভাবে এতকাল অবহেলায় লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়ে ছিল। সিংহ, হস্তী, বিভিন্ন ভঙ্গিতে নৃত্যরত যক্ষমূর্তি ও ফুলের মটিফ শোভিত ভগ্ন স্তম্ভও পাওয়া যায়। ভাস্কর্যের আর একটি অপূর্ব নিদর্শন হল বিশালকায় নন্দীমূর্তি। এটি প্রায় অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। শিব মন্দিরের সামনে নদীর অবস্থান ঐতিহ্যসম্মত; সেজন্য অনুমিত হয় যে মালিনীথানের নিকটে সম্ভবত শিবমন্দির ছিল। অন্যত্রও দেখা গেছে যে যেখানে শক্তির অধিষ্ঠান সেখানে শিবেরও অধিষ্ঠান। শিব ও শক্তির মিলিত রূপের সাধনা একদা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল। মালিনীথানে মিথুন মূর্তির প্রাচুর্যও তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাব সূচিত করে। আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে মালিনীথানের কিছু মটিফের সঙ্গে ডিমাপুরের ধ্বংসাবশেষের আশ্চর্য মিল দেখা যায়। তেজপুরের দহপর্বতীয়ার ধ্বংসাবশেষের সঙ্গেও গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। মালিনীথানের স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন ধারার বিশেষত ভাস্কর্যে ওড়িশি রীতির যে প্রভাব দেখা যায় তার থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে একদা এই অঞ্চল এত দুর্গম ছিলনা এবং হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিল। শ্রীলক্ষ্মীনাথ চক্রবর্তীর একটি কথা এখানে উল্লেখযোগ্য—'Malinithan is indeed a monument to the great synthesis of culture that took place in India through the ages.' ভাস্কর্যের রীতি ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বৈশিষ্ট্য থেকে মালিনীথানের কাল ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী বলে গৃহীত হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ কিংবদন্তীর সঙ্গে যুক্ত আর একটি ধ্বংসাবশেষ হল 'ভীষ্মকনগর'। লোহিত জেলার পূর্ব প্রত্যন্ত সীমায় মিশমি পর্বতের পাদদেশে দিক্রাং ও দিবং নদীর মধ্যস্থলে কুড়ি হাজার বর্গ পরিমিত এক বিশাল রাজপুরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে এখানে পুরাণখ্যাত বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের রাজধানী ছিল; সেজন্য এই স্থান ভীষ্মকনগর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৮৪৬ সালে অসমের পলিটিকাল এজেন্ট H. Vetch ও S.F. Hannay প্রথম এই ধ্বংসস্তূপটি দেখেন। তারপর এই অঞ্চল সম্পর্কে যাঁর বিবরণ পাওয়া যায় তিনি হলেন বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ D.T.Bloch; কিন্তু প্রকৃত খনন কার্য আরম্ভ হয় ১৯৬৭ সালে শ্রীলক্ষ্মীনাথ চক্রবর্তীর পরিচালনায়। পরবর্তি কালে ড, রাইকরের প্রচেষ্টায় বহু নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়।

ভারতের অন্যান্য স্থানের তুলনায় অরুণাচলের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি যে অত্যন্ত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার মূল কারণ হল এখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা— গভীর অরণ্য, খরস্রোতা পাহাড়ী নদী, বন্যা, ভূমিকম্প, দাবানল, হিমপ্রবাহ ইত্যাদি। ভীষ্মকনগরের অপরিসীম ক্ষতিসাধন করেছে অগণিত বিশাল গাছ, গভীর বাঁশবন, ঘন আগাছা ও লতাপাতার ঝোপ।

ভারতের পূর্বপ্রান্তে বিদর্ভ রাজ্যের রাজধানী ভীষ্মকনগরের অবস্থিতি কৌতূহলজনক, কারণ বিদর্ভ বলতে মধ্যভারতের বেরার অঞ্চলকেই বোঝায়। ভাগবত পুরাণে দেখা যায় বিদর্ভ রাজ ভীষ্মকের রাজধানী ছিল কুন্দিন। এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যে নদী প্রবাহিত হয়েছে তার নামও কুণ্ডিল। তবে এই নাম- রহস্য সম্পর্কে বলা যায় যে সুদূর অতীতে আর্যরা যখন বিভিন্ন স্থানে বসবাস আরম্ভ করেন তখন স্মৃতি হিসাবে পূর্ববর্তী স্থানের নাম, ইতিহাস ও ভাব কল্পনাও সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এভাবে তাঁরা একদিকে যেমন নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করতেন তেমনি বিচ্ছিন্নতার বেদনা থেকেও অব্যাহতি লাভের প্রয়াস করতেন। সেজন্যই হয়তো ভারতের বিভিন্ন স্থানে পুরাণ, ইতিহাস ও নামের পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল সুদূর অতীতেও মানুষ অতি দূরবর্তী, অজানা, দুর্গম স্থানে গিয়ে বসতি স্থাপনে দ্বিধা করতনা।

ভাগবত ও মহাভারতে ভীষ্মক রাজার কন্যা রুক্মিণীর রূপের খ্যাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। চেদিরাজ শিশুপালের সঙ্গে বিবাহে অনিচ্ছুক রক্মিণীর প্রার্থনায় দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভ রাজ্যে উপস্থিত হয়ে গোপনে তাঁকে হরণ করে নিয়ে যান। অসমের মধ্যযুগের সাহিত্যে 'রুক্মিণীহরণ' কাহিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। মহাপুরুষ শংকরদেবও 'রুক্মিণীহরণ'-নামে কাব্য রচনা করেছিলেন। অসমের বিবাহকালীন গীত 'বিয়ানামে' রক্মিণীহরণ একটি প্রধান বিষয়। এই অঞ্চলের জনজাতি ইদু মিশমিরা এই কাহিনি বিশ্বাস করে এবং নিজেদের ভীষ্মক রাজার বংশধর বলে মনে করে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে জনজাতির মধ্যে মিশমি মেয়েদের রূপের খ্যাতি আছে। এরা যে বিশেষ এক ধরনে চুল কাটে তাও এই কাহিনির সঙ্গে জড়িত। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করে নিয়ে গেলে ভীষ্মক তাঁর পুত্র রুক্মকে পাঠিয়েছিলেন রুক্মিণীকে উদ্ধার করবার জন্য। যুদ্ধে পরাজিত রুক্মকে শ্রীকৃষ্ণ বধ করতে উদ্যত হলে রুক্মিণীর মিনতিতে ক্ষান্ত হয়ে তরবারি দিয়ে তার মাথার চুল কেটে অব্যাহতি দেন। তখন থেকে মিশমিরা সেভাবে চুল কাটে।

আহোম জাতির আগমনের পূর্বে চুটিয়া জাতি এই অঞ্চলে এক শক্তিশালী হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। কথিত আছে যে চুটিয়া রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বীরপাল ছিলেন ভীষ্মক রাজার বংশধর। ভীষ্মকনগর আবিষ্কারের ফলে চুটিয়া জাতি যে কত উন্নত সভ্যতার অধিকারী ছিল তা জানা যায়। স্থাপত্য বিদ্যায়, ভাস্কর্যে ও কারুশিল্পে তাদের অসাধারণ দক্ষতা ছিল। সুদূর প্রত্যন্ত ভূমির অধিবাসী হয়েও আর্যাবর্তের আর্যদের তুলনায় তারা কোনো অংশে কম ছিলনা। আহোমদের আগমনের পূর্বে সুবনসিরি ও দিসাং নদীর প্রায় সমগ্র পূর্বাঞ্চল চুটিয়া রাজ্যের অধীন ছিল। তারা সদিয়া বা বিদর্ভে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। Gait এর বক্তব্য অনুসারে 'The chutiyas have numerous traditions all of which point to their having followed a Hindu dynasty in Sadiya or Vidarbha.'

ভীষ্মকনগরের স্থান নির্বাচন, নির্মাণ পরিকল্পনা ইটের তৈরি প্রাসাদ, চারিদিক ঘিরে প্রাচীর ও পরিখা, সুরক্ষিত বিশাল প্রবেশ দ্বার ইত্যাদি নগর নির্মাণ পদ্ধতির অতি উন্নত

নিদর্শন। ক্লাসিকাল হিন্দু স্থাপত্যের আদর্শ অনুসারেই এই পুরী নির্মিত হয়েছিল। কৌটিল্য রীতি অনুসারে প্রবেশদ্বারগুলি নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল পুরীর অভ্যন্তরে যাতে সহজে প্রবেশ করা সম্ভব না হয়। ভীষ্মকনগর বা অন্যান্য ধ্বংসস্তূপগুলির নির্মাণ পরিকল্পনায় একটা বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করার ব্যবস্থা। এই পুরী নির্মাণ কালে অন্যান্য স্থানের তুলনায় উন্নতমানের ইট ব্যবহৃত হয়েছে। ইটের উপর কিছু খোদিত লিপিও পাওয়া গেছে যেমন 'জপত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণম্'। ভাষা সংস্কৃত হলেও মধ্যযুগের অসমিয়া-বাংলা হরফে লেখা। অতি কারুকার্যপূর্ণ ইটের ভগ্নাংশও পাওয়া গেছে। পোড়া মাটির ঘোড়া, হাতি, ফুলের মটিফ, পানপাত্র, কলসি ইত্যাদিও অত্যন্ত উন্নতমানের। কুমোরের চাকে তৈরি মাটির পাত্রও পাওয়া গেছে যা এই অঞ্চলে অজ্ঞাত ছিল। সব কিছু মিলিত হয়ে একটি সত্যকেই নির্দেশ করছে— যারা এখানকার অধিবাসী ছিল তারা অত্যন্ত উন্নত এক সভ্যতার অধিকারী ছিল এবং আর্য সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। Gait-এর মতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সদিয়ায় চুটিয়া রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। আহোমদের সঙ্গে তাদের ক্রমাগত সংঘর্ষ চলছিল। অবশেষে ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আহোমরা তাদের যুদ্ধে পরাজিত করে রাজ্য ধ্বংস করে। ১৯০৫ সালে Dr.T.Bloch ভীষ্মকনগর দেখে যে উক্তি করেছিলেন তা অতি তাৎপর্যপূর্ণ— 'The country east of Sadiya was at former times better known to and in close touch with Aryan population of North India than at present.' আজও অরুণাচল প্রদেশ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অতি সীমিত বলা যায়।

চুটিয়া সভ্যতার সঙ্গে জড়িত একটি বিখ্যাত পীঠস্থান হল তাম্রেশ্বরী দেবীর মন্দির। লোহিত জেলার দেউলপানি নামে ছোটো একটি নদীর তীরে জনমানবশূন্য ঘোর অরণ্যে ইতিহাস খ্যাত তাম্রেশ্বরী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ছিল। এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কেঁচাইখাতী (যিনি কাঁচা মাংস খান) নামে প্রসিদ্ধা ছিলেন। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে বিহু উৎসবের সময় দেবীর কাছে মহা সমারোহে নরবলি দেওয়া হত। এই উৎসব দর্শনের জন্য ভারতের দূর দূরান্তর থেকে বিপুল জনসমাগম হত। কেবলমাত্র উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে নয় সমগ্র উত্তর ভারতে এই ভয়ংকরী দেবীর মহিমা প্রচারিত হয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে একসময় তাম্রেশ্বরী মন্দির ও তার মাহাত্ম্য কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়, কেবল পুরাণে তন্ত্রে ও জনশ্রুতিতে তার অস্তিত্বটুকু বজায় থাকে।

শক্তিপূজার প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে স্বীকৃত কালিকাপুরাণে দিক্করবাসিনী রূপে এই দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে।... সতীর দেহত্যাগের কাহিনির সঙ্গে জড়িত রয়েছে এই সিদ্ধপীঠ। দিক্করবাসিনী কেঁচাইখাতী বা তাম্রেশ্বরী নামে সুপরিচিতা ছিলেন। ইনি নীলাচলবাসিনী দেবী কামাখ্যারই অন্যতম রূপ বলে পূজিতা হতেন। 'পূর্ব কামাখ্যা' নামেও তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। যোগিনীতন্ত্রে দেখা যায় প্রাচীন কামরূপ রত্নপীঠ, কামপীঠ, স্বর্ণপীঠ ও সৌমার পীঠ এই চারটি অংশে বিভক্ত ছিল। উত্তর পূর্ব প্রত্যন্ত সীমায় অবস্থিত সৌমার পীঠ বা